নদীর নাম রাঙামাটি

তানজীল আরেফীন আদনান

নদীর নাম রাঙামাটি

তানজীল আরেফীন আদনান

সঞ্চালন
প্রকাশনী

উৎসর্গ

যার জীবন নিয়েই আস্ত একটা উপন্যাস লেখা যাবে, অথবা তিনিই হতে পারবেন কোনো উপন্যাসের মূল চরিত্র। জীবনটাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রেখে চলেন। বহু বছর আগে তার ব্যাচেলর বাসায় বালিশের নিচে কবিতার পাণ্ডুলিপির স্তূপ দেখে দেখে লেখালিখির স্বপ্ন জাগে মনে। বলছিলাম আমার ছোটো কাকা শাহের হাসানের কথা।

লেখকের কথা

মানুষের জীবনের নানা দিক রয়েছে; কখনো যেমন সে আনন্দে ভেসে বেড়ায়, আবার ঠিক তার জীবনে কষ্টের অনুষঙ্গও রয়েছে। এর কোনোটিই মানুষ এড়াতে পারে না। কিন্তু এসবের ধরন ভিন্ন হতে পারে। শহুরে মানুষদের আনন্দের সাথে যেমন গাঁয়ের মানুষদের আনন্দের পার্থক্য রয়েছে, তাদের কষ্টগুলোও এমন ভিন্নতর হয়ে থাকে। শহুরে মানুষেরা আনন্দ খোঁজে উঁচু দালানের চূড়ায়, দামি দামি রেস্টুরেন্টে আর নরোম বিছানায়। গ্রামের মানুষদের জীবন কিন্তু এমন নয়; তারা সুখ খুঁজে বেড়ায় বৃষ্টিমুখর দিনে টিনের চালের ঘরে শুয়ে। মাটির পাত্রে দু-মুঠ পান্তা ভাত আর কাঁচামরিচে। তাদের সুখ রয়েছে মায়ের নরোম-কোমল আঁচলতলে। কিন্তু এই সুখটুকু একে অপরে অনুভব করতে পারে না। জানতে পারে না একে অপরের দুঃখগুলোও।

আমার এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল এটাই, গ্রামের মানুষের কূলভাঙার গল্পগুলো, নদীর জলে তাদের ভিটেমাটি হারিয়ে নিঃস্ব হবার করুণ কাহিনিগুলো শহুরে মানুষ জানুক। তারা জানুক, এভাবেও জীবন চলতে পারে।

হুবহু কারও জীবনকে সামনে রেখে এ বই লিখিনি; তবে অনেকের সাথে মিলও রয়েছে। গতানুগতিক উপন্যাসের স্বাদ হয়তো এখানে পাওয়া যাবে না, তবে প্রথম উপন্যাস হওয়ার কারণে আবেগ-অনুভূতির কোনো কমতি ছিল না। বাকিটা নির্ভর করছে আল্লাহ তাআলা কতটুকু কবুল করবেন আর পাঠক কীভাবে গ্রহণ করবেন তার ওপর।

আল্লাহ আমাদের সবার ভালো করুন।

নদীর নাম
রাঙামাটি

এক.

মফস্‌সলগুলো আর আগের মতো নেই। আগে যেমন ডাক্তার দেখাতেও লরি বা ভ্যানে করে শহরে ছোটা লাগত, এখন মফস্‌সলেই এসব সুবিধা দিব্যি পাওয়া যায়। ঢাকার আশেপাশের মফস্‌সলগুলো ছিল প্রায় গ্রামের মতো। সন্ধ্যে হলে সেখানে নিয়ন আলোর বদলে ঘুটঘুটে আঁধার চোখে পড়ত। এই সেদিনও লোহারপুল থেকে নৌকোয় চড়ে ধোলাইখালের খাল পাড়ি দেয়া যেত। খালের স্বচ্ছ পানি গিয়ে মিশত তখনকার ঢাকার স্বচ্ছ পানির বুড়িগঙ্গায়। যাত্রাবাড়ীর পর থেকে ছিল শুধু সবুজ খেত আর খেত। বিকেল হলে শেয়ালের হুক্কাহুয়া ভেসে আসত কাছের কোনো ঝোপঝাড় থেকে। তখন সিলেটগামী একমাত্র মহাসড়ক ছিল ডেমরা হয়ে। পথের দু পাশে বিস্তৃত খেত, এর মাঝ দিয়ে হু হু করে চলে যেত বড়ো বড়ো গাড়ি, কোনোটা সিলেট, কোনোটা বা চট্টগ্রাম। মাঝে মাঝে ঘোড়ার গাড়িও চলত এ পথে। বড়ো সাহেবেরা চড়তেন তাতে।

এখনকার চিত্র পুরো ভিন্ন। মফস্‌সলগুলো ধীরে ধীরে শহর হতে শুরু করেছে। ভ্যানের বদলে সেখানে এখন প্রাইভেট কার আর রিকশার দাপট বেশি। চারিদিকে দালান-কোঠায় ভরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আগে যেমন জোরে নিঃশ্বাস নিলেই মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে আসত, এখন আসে দুর্গন্ধ, ধুলোবালি। গাঁও-গেরামের খেটে খাওয়া মানুষেরা এখানে আসে পেটের দায়ে। কম টাকায় কোনোরকম দুই রুমে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয় এখানে। আরও বড়ো কথা এখান থেকে শহরের অফিসপাড়াগুলো কাছেই। সকালে ভিড় ঠেলে লোকাল বাসে ওঠো। হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে অফিসে যাও। এরপর আটটা-পাঁচটা অফিস করে ফের একইভাবে বাসায় ফেরো। ব্যস। এটাই এই মফস্‌সলের বেশির

ভাগ মানুষদের অভ্যেস। সবাই আবার এমন নয়। কেউ আছে চাকরির খোঁজে সেই যে এখানে এলো, দিন ঘুরছে ঠিকই, আয়-রোজগারের চাকা তাদের ঘুরছে না। শফিকের অবস্থাও এমন। বরিশালের নদীপাড়ের মানুষ এখানে এলো একটা ভালো চাকরির আশায়। কে দেয় কাকে চাকরি! গায়ের ছেলে এলো শহরপাড়ায়। আসবার কালে কতকিছু বলে এলো মাকে। দু বছর পর মাকে ঢাকায় নিয়ে আসবে। লাকড়ির ধোঁয়ায় আর রাঁধতে হবে না। ওষুধ কিনতে আর মাইলখানেক দূরে নদী পার হয়ে গোমাবাজার যাওয়া লাগবে না। শহরে এসব হাতের কাছেই পাওয়া যায়। সেসব স্বপ্ন আর পূরণ হলো না। নিজেরই ঠিকমতো থাকবার ব্যবস্থা হচ্ছে না এখনো।

রকেটে করে যেবার ঢাকা এলো শফিক, ঢাকা তখন পুরোনো আমেজেই ছিল। চাঁদে যাবার রকেটের কথা বলছি না, ঢাকা থেকে বরিশাল অবধি স্টিমার চলত তখন। ওটাকেই রকেট বলা হয়। কতশত স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় এসেছিল কেবল দু শ টাকা সাথে নিয়ে। স্বপ্নপূরণ হলোই বা কদ্দূর! স্বপ্নপূরণের নেশায় বৃথা চেষ্টা করেই যাচ্ছে শুধু।

ইদানীং আবার রাতে ঘুম হয় না শফিকের। মনে পড়ে বাড়ির কথা। মা বুঝি এখনো রাঙামাটি নদীর তীরে বসে চেয়ে আছেন দূরে...। ছেলে আমার এই এলো বুঝি! নৌকোর গলুইয়ে বসে সেই যে ছেলে গেল ঢাকার পানে! আবার আসবে কবে কে জানে! তজুমুদ্দীর বাড়ির ঘাট থেকে স্টিমার ঘাটের উদ্দেশ্যে যখন নৌকো ছেড়ে যায়, মা তখন দূর থেকে হাত নাড়িয়ে বলছিলেন, ঢাকা গিয়ে চিঠি পাঠাইস বাবা। পড়ালেখা কেমনতারা চলে জানাইস। মুই কোলাম অপেক্ষায় থাকব।

দিনকাল ভালো যাচ্ছে না এখন। বাড়ির ছেলেপেলেরা সব ছুটছে শহরের দিকে। বাড়িতে একা পড়ে থাকে বৃদ্ধ মা-বাবারা। এই বদ রসম কীভাবে যে শুরু হলো! পুরো বাড়ি যেন খাঁ খাঁ করে। ছোটো ছেলেপেলে আর বাড়ির ময়-মুরুব্বিরা ছাড়া বাড়িতে যুবক পাওয়া যেন দায়। শুধু দুই ঈদে শহর থেকে সবাই বাড়িতে আসে বেড়াতে। তখন বাড়ির পরিবেশ বেশ জমজমাট থাকে। বহুদিন পর সবাই একসাথে হয়। ঈদের দুই দিন পর থেকে আবার সবাই বিদায় নেয়া শুরু করে। ফের খালি হতে থাকে বাড়িঘর।

শহরে আসার অনেক বছর পর শফিকের মনে হলো, এবার ফিরতে হবে নাড়ির টানে। মায়ের গ্রামে। শহরে সবাই যে স্বপ্ন নিয়ে আসে তা সব পূরণ হয় না। কিছু স্বপ্ন অধরাই রয়ে যায়।

মা কত চিঠি পাঠালেন, এবার ফিরে আয় বাবা। ঢাকায় তোর কষ্ট হচ্ছে। বাড়িতে আয়। গেরস্তের কাজবাজ করে চল।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে রাত পেরিয়ে সুবহে সাদিকের রেখা ভেসে উঠল, টেরই পেল না শফিক। ভোর তখন চারটা। খানিক বাদেই ফজরের আযান দেবে মুয়াজ্জিন। শফিক পায়চারি করছে ঘরজুড়ে। বিছানায় শুয়ে আছে সহজ-সরল বউ আমেনা। ঘরের আলোখানা জ্বালিয়ে রেখেছে এই সহজ-সরল আমেনাই। বেকার শফিকের যেখানে গাঁটের পয়সা দিয়ে ছাই কেনারও মুরোদ নেই, ঘরের সদাই করবে কোত্থেকে! আমেনা সেখানে ধারদেনা করে, পুরোনো কাপড়চোপড় বিক্রি করে দুটো শাক-পাতার ব্যবস্থা করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। নিজের অসুস্থ শরীরকে একটু বিশ্রাম দেয়ারও ফুরসত মেলে না যেন! ভালো ডাক্তার দেখাতে হবে। কিন্তু পয়সাই তো নেই!

একটা চাকরি হলে ডাক্তার দেখানো যেত আমেনাকে। বহুদিন ধরে রোগেশোকে ভুগছে বেচারি। শুকিয়ে একদম এটুকু হয়ে গেছে মুখখানা।

জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে শফিক। বাইরে এখনো আলো ফোটেনি ঠিকমতো। রাত্রিচরদের বাঁশির আওয়াজ ভেসে আসছে দূর থেকে। শেষরাতে তারা এভাবে মানুষকে জাগিয়ে থাকে নামাজের জন্য। আবার কখনো ছিঁটকে চোরদের সতর্কবার্তা দেয়ার জন্যও বাঁশি বাজিয়ে থাকে।

প্রতিদিন শেষ রাতে এভাবে পায়চারি করে শফিক। ফজরের আগমুহূর্তে এমন পায়চারির অভ্যাস তার বহু পুরোনো। মধ্যবিত্তদের এটা মনে হয় রোজকার অভ্যাস। এমনিতেই চিন্তায় তাদের ঘুম হয় না তেমন। শফিকেরও চিন্তার অন্ত নেই। বাড়িওয়ালা গতকাল বলে গেলেন, গত ছয় মাসের ভাড়া যেন আগামী মাসেই দেয়া হয়। নাহয় তিনি তার ভাগনীকে এ বাসায় ওঠাবেন। দোকানদার মনির মিয়াঁ আর সদাই দেবেন না বলে দিয়েছেন। সাত হাজার টাকা বাকি রেখে আর বাকিতে সদাই দেবেনই বা কীভাবে! অনেক ভাড়াটিয়া বাকি টাকা না দিয়েই বাসা ছেড়ে চলে গেছে।

এসব ভাবতে ভাবতে ফজরের আযান শুরু হয়ে গেল। শফিক ওযু করতে গেল। টয়লেটের টিনের চাল ফুটো হয়ে সেখান থেকে পানি পড়ছে গায়ে। পুরো ঘরে এমন অনেক ফুটো আছে। বৃষ্টি হলে ঘর ভেসে যায় পানিতে। মধ্যবিত্তের ঘর ভেসে যায় দুই রকম পানিতে। এক তার চোখের পানি, আরেকটি হলো চাল বেয়ে পড়া বৃষ্টির পানি।

ওযু করে ঘরে ফিরে দেখল, রাফির মা উঠে বসে আছে। ধমকের সুরে